Vol. 44 | No. 2 | 2001



Check for updates



# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd


## নবাবগঞ্জ জেলার জনবিন্যাস, ভাষাপরিস্থিতি ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ


| | |
|---|---|
| Volume | 44 |
| Issue | 2 |
| Year | 2001 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | সালিম সাবরিন |
| Published online | February 1, 2001 |
| DOI | 10.62328/sp.v44i2.5 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v44i2.5 |
| Pages | ৭৫-৯৮ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# নবাবগঞ্জ জেলার জনবিন্যাস, ভাষাপরিস্থিতি [illegible]শ্লেষণ

সালিম সাবরিন *

## প্রস্তাবনা

জনবিন্যাস ও ভাষিক এলাকা হিসাবে নবাবগঞ্জ বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে নানাভাবেই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। যে কোন জাতীয় সীমানায় ভাষা ও উপভাষা পরিস্থিতির ভিন্নতা তথা বৈচিত্র্য থাকে। এই জন্যে জাতীয় সীমানার মধ্যে উপভাষার ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত করা হয়। উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী নবাবগঞ্জ জেলার জনবিন্যাস ও ভাষিক পরিস্থিতি অনুসন্ধানের প্রয়োজনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে জেলার জনবিন্যাস ও ভাষিক স্বাতন্ত্র্য বোঝা যাবে: ১. জেলার ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ। ২. জনবিন্যাস ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। ৩. ভাষা-পরিস্থিতি। ৪. ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

## ১. ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ

নবাবগঞ্জ বাংলাদেশের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের একটি জেলা। জেলার মোট আয়তন ৬৬৭ বর্গমাইল।[১] মোট জনসংখ্যা ৯,৩২,৯২০ জন।[২] ভৌগোলিকভাবে ২৪°২৬´ থেকে ২৪°৫৭´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০১´ থেকে ৮৮°৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে জেলার অবস্থান।[৩]

বাংলাদেশে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে নবাবগঞ্জ জেলার মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। প্রাচীন গৌড়ের রাজধানীর সন্নিকটবর্তী নবাবগঞ্জ যেমন বহু পুরাকীর্তি ধারণ করে আছে, তেমনি নবাবী আমলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের নবাবদের স্মৃতিধন্য নবাবগঞ্জ বহু কিংবদন্তীর সাক্ষী হয়ে আছে। ১৮৭৯ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবাবগঞ্জ বিহারের ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের সময় নবাবগঞ্জ ভাগলপুর বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত হয়। নবাবগঞ্জ, নাচোল, পোরশা, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জসহ মোট ছয়টি থানা মালদহ জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে নবাবগঞ্জ রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে উক্ত ছয়টি থানা মালদহ জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজশাহী জেলার অধীনে আসে। ১৯৪৮ সালের ১ নভেম্বর উল্লিখিত থানা ছয়টি নিয়ে নবাবগঞ্জ মহকুমায় উন্নীত হয়।[৪] দেশব্যাপী ব্যাপক প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর পোরশা থানা হারিয়ে নবাবগঞ্জ মহকুমা থেকে জেলায় উন্নীত হয়।[৫] পোরশা থানা চলে যায় নওগাঁ জেলায়।

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।

ভূ-প্রকৃতি ও ভাষিক বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে নবাবগঞ্জ জেলাকে প্রধানত দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। জেলার প্রধান দুই নদী মহানন্দা ও পদ্মার পশ্চিম-উত্তরের সমভূমিটি বেলে দোআঁশ মাটির দিয়াড় অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। অন্যদিকে, মহানন্দার পূর্বাংশের অসমতল এঁটেল লালমাটির অঞ্চলটি বরেন্দ্র নামে পরিচিত। আরো সূক্ষ্ম বিচারে নবাবগঞ্জের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়।

ক. **দিয়াড় অঞ্চল** : পদ্মা ও মহানন্দার উত্তর-পশ্চিম অংশ। এই অঞ্চল বন্যাকবলিত। দিয়াড় এলাকার শিবগঞ্জ ও ভোলাহাট থানার কিয়দংশ গৌড় অঞ্চলরূপে চিহ্নিত। এখানে বন্যার প্রকোপ কম। দিয়াড়ে আউস ধান, পাট, কলাই, শ্যামা প্রভৃতি ফসল ফলে। গৌড়াঞ্চলে ইক্ষু, পাট, তুত, হলুদ, ভুট্টা ও রবি ফসল ভাল হয়।

খ. **বরেন্দ্র বা বিল অঞ্চল** : নবাবগঞ্জ সদর থানার পূর্ব-উত্তর থেকে নাচোল ও গোমস্তাপুর থানার পূর্বাংশ নিয়ে বরেন্দ্র ভূমি বা বিল অঞ্চল। সেখানে বেশ কয়টি বড় বিল আছে। রোপা আমন ধান বা হৈমন্তিক ফসল ছাড়াও সরিষা, মরিচ ইত্যাদি ফলে।

গ. **কান্দি অঞ্চল** : কান্দি অঞ্চল বলতে মহানন্দা নদীর দুধারের অংশ বোঝানো হয়। কান্দি এলাকা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ ও উর্বরা। ধান, পাট, আঁখ, দোঁ-ফসলা রূপে রবি শস্যের চাষ হয়।

নবাবগঞ্জ জেলার পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ, পূর্বে বাংলাদেশের রাজশাহী ও উত্তরে নওগাঁ জেলা। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্সি বাংলার মানচিত্রে রাজশাহী, মালদহ ও দিনাজপুর জেলার সীমানা চিহ্নিত ছিল। পৃথকভাবে নওগাঁ ও নবাবগঞ্জের উল্লেখ ছিল না। তৎকালে নওগাঁ বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা এবং নবাবগঞ্জ মালদহ জেলার অধীনে ছিল।

## ২. জনবিন্যাস ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে নবাবগঞ্জ জেলার অবস্থানগত সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। জনবিন্যাসের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছে। অন্যদিকে বাচকগোষ্ঠীর ওপর এসেছে ভিন্ন ভাষার প্রভাব। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে জনসংখ্যার বড় অংশ বাঙালি মুসলমান-হিন্দু হলেও কয়েকটি তপশীলি জাতি এবং উপজাতি রয়েছে। জনবিন্যাসের জরিপে দেখা যায়, ১৯২১ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মালদহ জেলায় বাঙালি, হিন্দুস্থানি, নেপালি, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং তিব্বতি-বর্মী বাচকগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। তাঁদের ভাষিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ: বাঙালি ৭,৭৩,০৯৪ জন; হিন্দুস্থানি ২,০১,৭৩৫ জন; নেপালি ৭৭ জন; অস্ট্রিক ৭৪,৫১৬ জন; দ্রাবিড় ৪,০২২ জন; তিব্বতি-বর্মী ২ জন।[৬]

উল্লিখিত জনবিন্যাস ও বাচকগোষ্ঠীর প্রভাব নবাবগঞ্জেও ছিল। নবাবগঞ্জের দিয়াড় অঞ্চলের ভাষায় মালদহের প্রভাব সুস্পষ্ট।[৭] ১৯৪৭ সালে নবাবগঞ্জ মহকুমা রাজশাহী জেলার অধীনে আসার পর পুরো জেলার ভাষিক জনবিন্যাসে বাংলা, উর্দু, ফারসি, আরবি, সিন্ধি, পশতু, পাঞ্জাবি প্রভৃতি

বাচকগোষ্ঠী ছিল। তাঁদের ভাষিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ : বাঙালি ২৮,১০,৯৬৪ জন; উর্দু ১৮,৭৯৬ জন; ইংরেজি ১৭,৯৭০ জন; পারসিয়ান ১,৫৩৩ জন; আরবি ২,১২৩ জন; সিন্ধি ৪৫৬ জন; পশতু ১৯৪ জন; পাঞ্জাবি ১৬১ জন।[৮]

বলাবাহুল্য, উর্দু, সিন্ধি, পশতু, পাঞ্জাবিভাষী অভিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই নবাবগঞ্জ অঞ্চলে বসবাস করতেন। অধিকন্তু ১৯৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যাপক বহুভাষী জনগোষ্ঠীর অভিবাসন ঘটে। পক্ষান্তরে বহু উচ্চবিত্ত হিন্দু পরিবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যান। অবিভক্ত বাংলায় একদিকে বিহারের সাঁওতাল পরগনা থেকে সাঁওতালরা এই অঞ্চলে অভিবাসন গড়ে তোলে, পুরুলিয়া থেকে মাহাতো সম্প্রদায়, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স অঞ্চল থেকে রোগব্যাধি তথা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এড়াতে রাজবংশী সম্প্রদায়ও এই অঞ্চলে চলে আসে। ফলে নবাবগঞ্জের জনবিন্যাসের তালিকায় বিভিন্ন ভাষা ও ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম যুক্ত হয়। নবাবগঞ্জ জেলার পাঁচটি থানায় ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার তালিকা নিম্নরূপ :

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার শতকরা হার

| থানা | মোট জনসংখ্যা | মুসলমান | হিন্দু | বৌদ্ধ | খ্রিস্টান | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ভোলাহাট | ৫৪,৫৩৪ | ৯৮.০৭ | ১.০৩ | - | - | - |
| গোমস্তাপুর | ১,৫৩,৮৩৩ | ৯০.০০ | ৮.০০ | - | ০.০৩ | ১.০৭ |
| নাচোল | ৭৪,৮৬০ | ৭৮.০৬ | ১৮.০৪ | - | ০.০৮ | ২.০২ |
| শিবগঞ্জ | ৩,৩৪,২৩১ | ৯৫.০৯ | ৪.০১ | - | - | - |
| নবাবগঞ্জ | ৩,১৫,৪৬২ | ৯৪.০১ | ৫.০১ | - | ০.০১ | ০.০৪ |
| মোট | ৯,৩২,৯২০ | ৯৩.০০ | ৬.০১ | - | ০.২ | ০.৭ |

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার শতকরা হারের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, মুসলমান প্রধান হলেও ওই অঞ্চলে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরাও বাস করে।

শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাসেই নয়, ভাষার সামগ্রিক সমাজপরিস্থিতি নির্দেশের জন্য পেশাভিত্তিক অবস্থান নির্দেশ করা প্রয়োজন। কারণ, "সামাজিক ভাষার বৈষম্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থানেই শিক্ষা রুচিবোধ, সংস্কৃতি, পেশা ও অর্থনৈতিক দিক বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে।"[৯] নবাবগঞ্জ জেলার পেশাভিত্তিক এবং খামার-বহির্ভূত দুটো শ্রেণী রয়েছে। খামার-বহির্ভূতরাই অধিকাংশ ভূমির মালিক। কিন্তু যারা খামারে কাজ করেন তাঁরাই মূলত ভূমিহীন। অন্যদিকে রেশমশিল্প, তাঁতশিল্প, অন্যান্য বয়নশিল্প, কাঁসা বা পিতল শিল্প, মৃৎশিল্প এবং ব্যবসায়ী পেশাজীবী শ্রেণীও রয়েছে। নবাবগঞ্জ জেলার পেশাভিত্তিক জনবিন্যাস নিম্নরূপ :[১০]

| | কৃষিজীবী | | অকৃষিজীবী | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| থানার নাম | খামার বহির্ভূত | খামারভুক্ত | শিল্প | ব্যবসা | অন্যান্য পেশা | মোট |
| ভোলাহাট | ৪৯৪ | ৮,৭০৯ | ৭০ | ৯৭৪ | ১,৮৪৮ | ১২,০৯৯ |
| গোমস্তাপুর | ১,১৯৬ | ২২,৯৬৪ | ৭১৬ | ৪,৪৯৩ | ৮,৬৯২ | ৩৮,০৬১ |
| নাচোল | ১১২ | ১১,৯৯৭ | ১৩১ | ১,২৮৮ | ৪,৬০২ | ১৮,১৩০ |
| নবাবগঞ্জ | ১,৩৬৪ | ৩১,৩৫৭ | ১,৫৮৭ | ১১,১৮৩ | ১৯,৯৯৪ | ৬৫,৪৮৫ |
| শিবগঞ্জ | ১,৫৮৪ | ৪৪,৮২৭ | ১,১৭১ | ৭,৯৭০ | ১৮,৬৪২ | ৭৪,১৯৪ |
| মোট | ৪,৭৫৪ | ১,১৯,৮৫৪ | ৩,৬৭৫ | ২৫,৯০৪ | ৫৩,৭৭৮ | ২,০৭,৯৬৯ |

লক্ষণীয়, জনসংখ্যানুপাতে বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা বেশি। দিয়াড় বা চরাঞ্চলের মানুষের মধ্যে কৃষিজীবী ছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের অধিবাস লক্ষ করা যায়। নবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জ থানায় অন্যান্য পেশাজীবী মানুষের মধ্যে রয়েছে রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, জনমজুর, কালোবাজারী, মাঝি, জেলে, তাঁতী, কুমার, কামার, মুচি ইত্যাদি। হিন্দু জেলেরা হালদার এবং মুসলমান জেলেরা ললিয়া বা লোল্যা নামে পরিচিত। মূলত গোমস্তাপুর, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ এই চারটি থানায় নদনদী থাকায় অনেক মানুষই নদীকেন্দ্রিক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। নাচোল থানায় কোন নদী না থাকায় বিলকেন্দ্রিক ভূমিজ জীবনে শুধুই কৃষির উপর এই থানার অধিবাসীরা নির্ভরশীল। এই থানার মানুষ তুলনামূলকভাবে শ্রমবিমুখ। নাচোল থানায় সাঁওতাল, মাহালি, রাজবংশী, মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসবাস। তাদের প্রত্যেকের ভাষার ছাঁদে নিজস্ব রীতি রয়েছে। এই থানার মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যেও দুটি রীতি লক্ষ করা যায়। যেসব মুসলমান এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা তাঁরা 'বরিন্দ্যা' নামে পরিচিত। যারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে অভিবাসন করেছেন তাঁরা রিফিউজি নামে পরিচিত এবং নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ অঞ্চল থেকে যারা অভিবাসন করেছেন তাঁরা 'দিয়াড়া' নামে পরিচিত। লক্ষ করা যাবে, আদি বাসিন্দা বরিন্দ্যাদের ভাষার সঙ্গে দিয়াড়া ও রিফিউজিদের ভাষা সংস্কৃতির ব্যাপক পার্থক্য আছে। আবার আদি বাসিন্দা বরিন্দ্যাদের ভাষার মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। দিয়াড় ও বরেন্দ্র অঞ্চলের মাঝামাঝি অর্থাৎ ফতেপুর ইউনিয়নকে বলা যায় সন্ধি অঞ্চল। এই অঞ্চলের ভাষায় বরিন্দ্যা ও দিয়াড়া উভয় ভাষারই প্রভাবে রূপমূলগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গ ভাষা-পরিস্থিতিতে আলোচনা করা হবে।

ধর্মীয় ও পেশাগত জীবনবিন্যাসে দেখা যাচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই একভাষী সাংস্কৃতিক আবহে অভ্যস্ত এবং তাদের প্রধান পেশাই হচ্ছে কৃষি।[১১] সুতরাং এই জনপদে কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির প্রভাবে হিন্দু-মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব ঐক্য রয়েছে। বস্তুত "ধর্ম যাই থাক, কৃষি সকলের প্রধান উপজীবিকা। তারা ফলায় ধান, পাট, আলু, তামাক, আখ, রেশম আরও সব অমূল্য সম্পদ। মাটি তাদের জোগায় পেটের অন্ন এবং পরনের বস্ত্র। অর্থাৎ মাটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের দৈনন্দিন হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ-উৎসব। মাটির মায়া তাই তাদের স্বভাবজাত। বস্তুত মাটিই তাদের করেছে একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক অন্তর্মুখী"।[১২]

তবে মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অবশ্যই আমরা স্মরণে রেখে বলব 'উৎপাদনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদের অগ্রসর' সমাজগতিশীলতাকে বদলে দেয়।[১৩] স্বাধীনতা-উত্তর সমগ্র বাংলাদেশের মত এই জেলাতেও বহুজাতিক ঋণসংস্থা, কুটির শিল্পের বিলোপ, মাঝারি শিল্পের প্রসার, কৃষির যন্ত্রায়ণ ইত্যাদি বহুবিধ কারণে লাইফপ্যাটার্ন বদলে গিয়েছে। প্রকৃত ভূমিজ স্বত্বভোগীরা ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা ভূমির স্বত্বভোগ করছে। কাজেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীস্তর বা বিভাজন যেমন হয়েছে, তেমনি মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত নিম্নবিত্ত ও নিরক্ষর জীবন-আচরণে ও সংস্কৃতিতেও পার্থক্য সূচিত হয়েছে। তবুও সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, ভৌগোলিক জীবনবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্ন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বর্তমানেও রক্ষিত হয়েছে।[১৪]

### ৩. ভাষা-পরিস্থিতি

অবিভক্ত বাংলার জেলাভিত্তিক উপভাষার একটি প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন করেছিলেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। শতবর্ষ পূর্বের জরিপকৃত তথ্য বর্তমানে বহুভাবে পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। বাংলা ভাষা-মানচিত্রের প্রায় ৩০ কোটি মানুষের ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষারূপ সন্ধানে বহু গবেষক মূল্যবান গবেষণা সম্পাদন করেছেন। বর্তমানেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। রাজশাহীর পশ্চিমাঞ্চল নবাবগঞ্জ জেলার (পাঁচটি থানা) উপভাষা নিয়ে এখনও কোন জরিপ সম্পন্ন হয়নি। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ড. আব্দুর রহীম খোন্দকার 'গৌড়ীয় উপভাষা' (১৩৮৮) এবং 'বরেন্দ্র ভূমির ভাষা' (১৪০৪) শীর্ষক প্রবন্ধে এই অঞ্চলের ভাষাতাত্ত্বিক রূপরেখা নির্দেশ করেছেন। 'গৌড়ীর উপভাষা' প্রবন্ধে তিনি রাজশাহীর গোদাগাড়ী, নবাবগঞ্জের সদর থানা, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, মালদহের কালিয়াচক, মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর ও লালগোলা থানায় প্রচলিত উপভাষা সীমানার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। তিনি নবাবগঞ্জের উপভাষার নাম 'গৌড়ীয় উপভাষা' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, "মুসলমান যুগের প্রারম্ভকালে বাংলাদেশের রাজধানী ছিল গৌড়। এই গৌড় বর্তমান মালদা জেলায় অবস্থিত। লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে এর অন্য নাম লক্ষ্মণাবতী। যেহেতু আলোচ্য উপভাষা মূলত অবিভক্ত মালদা জেলার কথ্য ভাষা সেহেতু অন্য নামের অভাবে এ উপভাষাকে গৌড়ীয় উপভাষা নামে অভিহিত করাই সঙ্গত হবে।"[১৫] আমরা স্মরণ করতে পারি বৃহত্তর বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নাম রামমোহন রায় রেখেছিলেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার উৎস বলে গৌড়ীয় অপভ্রংশকেই নির্দেশ করেছিলেন। সুতরাং এই গৌড়াঞ্চলের উপভাষার নাম 'গৌড়ীয় উপভাষা' যুক্তিসংগত। তবে গৌড়ীয় উপভাষার সঙ্গে বরেন্দ্রী উপভাষার পার্থক্য আছে। বর্তমান নবাবগঞ্জ জেলার পাঁচটি থানার উপভাষাকেই গৌড়ীয় উপভাষা রূপে চিহ্নিত করা সংগত নয়। যেহেতু এই জেলার গোমস্তাপুর থানার উত্তর-পূর্বাংশ এবং নাচোল থানার কসবা, নাচোল ও নেজামপুর ও ফতেপুর ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা বরেন্দ্র সীমার অন্তর্গত সে জন্যে নবাবগঞ্জের উপভাষাকে গৌড়ীয় উপভাষা ও বরেন্দ্র উপভাষার দুই সীমানায় চিহ্নিত করা প্রয়োজন। ব্যাপক অর্থে নবাবগঞ্জের দিয়াড় অঞ্চলের উপভাষায় যেমন গৌড়ীয় উপভাষার প্রভাব লক্ষণীয়, তেমনি বরেন্দ্র

অঞ্চলের উপভাষাতেও পশ্চিম নওগাঁ জেলার উপভাষার প্রভাব আছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বাচকগোষ্ঠী রয়েছে। মোটামুটিভাবে নবাবগঞ্জ জেলার প্রচলিত উপভাষা ও বাচকগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার একটি সামগ্রিক পরিস্থিতি উপস্থাপনের জন্যে উপভাষা নমুনা নেওয়া যেতে পারে। নিম্নের নমুনা থেকে নবাবগঞ্জের ভাষা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা অর্জন করতে পারি।

**শিষ্ট বাংলা**

এক ব্যক্তির দুটি পুত্র সন্তান ছিল। তার মধ্যে ছোট ছেলে তার বাবাকে বলল বাবা বিষয়ের যে অংশ আমার প্রাপ্য তা আমাকে দিন। তিনি তাদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন।

**দিয়াড় বা গৌড়ীয় উপভাষা**

কুনুহ্ এ্যাকঝন লোখের দুঠাহ্ ছ্যাল্যা ছিলো। তারঘেমোধে ছোঠ ছ্যাল্যা আর বাপুখে কহ্লো বাপুজ্বি হাঁর পাওনা সম্পোতির ভাগ হাঁকে দিয়্যা দ্যাও। উঁতারঘেমোধে অর সম্পোতির বাহ্যাট্যা দিল।

**বরেন্দ্র অঞ্চলের উপভাষা**

কুনু এ্যাক লুকের দুট্যা ব্যাটা ছাওয়াল আছ্লো। অগরেমদ্যে ছুটু ছাওয়াল উঁর বাপোক বুউল্লো বাগে মুই সম্পতির যেকুনা পামু সেকুনা মুক দিয়্যা দ্যাও। উঁই তাগরেমদ্যে উর সম্পতি ভাগ করয়া দিল।

**দিয়াড়-বরেন্দ্রের মাঝামাঝি সন্ধি অঞ্চলের উপভাষা**

কুনু এ্যাকজুনা ম্যানশের দুটা ব্যাটা ছাওয়াল আছোলো। অঘেরেভিতোর ছুটু ছাওয়াল অর বাপেক ব্যলোলো বাগে হামি সম্পতির যেক্ন্যা পাবো সেক্ন্যা হামাক দিয়্যা দ্যাওধিনি। উঁই অঘেরেভিতোর ওঁর সম্পতি ভাগ করয়া দিলো।

**রাজবংশী উপভাষা**

কোনু এ্যাকঝন্কার দুঝন বেটা আছিল। অমহার মধ্যৎ ছোটু বেটা আর্ বাপোক কহালো কি বোলে বাগো মুর সম্পতির মুই যে ভাগ পামু তা তুই মুক্ দে। ওঁয়াদের বাপ ওঁয়াদের মধ্যৎ সম্পতি বাটি দিল।

**মাল-পাহাড়ী উপভাষা**

কনঃ এ্যাকঝন্ লোখের দুঝন্ ব্যাটা ছ্যালা আছ্লোক বঠে। ওঠের মৌদেঃ ছুঠ্ ছ্যালা উঁহার বাফ্খে বুল্লোক বাফ্রে জাগাজিরাতের যে ঠিন হামার পানাঃ আঁছেক সেঠিন হাম্কে বঁহাঁট্যা দে। উঁহার বাফে উঁহাদিগের ভিৎরেঃ জাগাজির্যাত বাঁহাঁট্যা দিলোক

**সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভাষা**

মিৎটেন্ হড়রেন বারইয়া গিদরোকিন তাহেলিনা। উনকিন ভিতরিরে কাটিঃ গিদরেরাই আই বাবাই মিতাদিয়া সম্পত্তিরিয়োঃ ইনাঃ ভাগ'দ্য ইন ইমাইনমেঃ। উনি উনকিন ভিতরিরে সম্পত্তিই ভাগ আঃ কিনা।

**মাহাতো সম্প্রদায়ের ভাষা**

এগ্ এড়মিনকে দুইগ বেটা ছওয়া হেলেই। সেকার ভিতরো ছটকা বেটা বাপকে কাহলেই বাবা হামলো জিনসু আধখান জে পাতেই হামকে দে দো। সেংকার ভিতরে ভিঠাদেই দো।

বস্তুত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে সামগ্রিকভাবে একটি অখণ্ড উপভাষা অঞ্চল গড়ে ওঠেনি। একই অঞ্চলে বহুবাচকগোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ করা যায়।[১৬] আলোচ্য কেন্দ্রীয় এলাকায় (Focal area)

আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচকগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যাবে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তাদের ভাষিক ছাঁদও আলাদা। তবে উল্লিখিত ভাষাপরিস্থিতিতে বোঝা যায় নবাবগঞ্জ জেলার প্রভাবশালী ভাষিকগোষ্ঠী দু'টি: গৌড়ীয় উপভাষা বাচকগোষ্ঠী এবং বরেন্দ্রী উপভাষা বাচকগোষ্ঠী। এই দুই প্রধান বাচকগোষ্ঠীর ভাষিক ও অর্থনৈতিক চাপে অন্যান্য সংখ্যালঘু তপশিলি হিন্দু ও আদিবাসীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। বর্তমানে রাজশাহী জেলার কয়েকটি স্থানে সাঁওতালি ভাষায় স্কুলের পাঠক্রম চালু হয়েছে। শেষপর্যন্ত এই কার্যক্রম চালু থাকলে এই ভাষা সম্প্রদায় বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মেদেনীপুরে সাঁওতালি ভাষার শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে, পরবর্তীকালে লেপচা, মেচ, ভূটিয়া, রাভা সাদরি ও অন্যান্য ঔপজাতিক ভাষা শেখাবার ব্যবস্থাও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন।[১৭] বাংলাদেশে এখনও সচেতনভাবে এধরনের শিক্ষাক্রম চালু হয়নি। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচকগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সংশয়াকীর্ণ এ কথা বলাই বাহুল্য।

## ৪. ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বর্তমান আলোচনা নবাবগঞ্জ জেলার প্রধান দুই বাচকগোষ্ঠী অর্থাৎ গৌড়ীয় উপভাষা এবং বরেন্দ্রী উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য ক্ষুদ্র বাচকগোষ্ঠীর ভাষা জরিপের জটিলতার জন্যই মূলত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে আলোচ্য অংশ প্রধান দুই বাচকগোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাষারূপ বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত প্রয়াস মাত্র। বর্তমান নিবন্ধে মূলত সমাজভাষাতাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক রীতি অবলম্বন করা হলো।

### ৪. ক. সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মানুষ সমাজে বসবাস করলেও যতটুকু সমাজজীবী তার চেয়ে বেশি ভাষাজীবী। সমাজজীবী ও ভাষাজীবী উভয়ের সমন্বয়েই মানুষের বিকাশ। উভয় সংশ্রয়ই মানুষের যৌথ সম্পদ।[১৮] গোষ্ঠী সংহতি বা গোষ্ঠীসত্তাবোধও গড়ে ওঠে ভাষিক সূত্রে। সামাজিক স্তরের উপরিকাঠামো এবং রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে তো বটেই। আমেরিকার ব্ল্যাক ইংলিশ, সুইজারল্যান্ডের নিম্নজার্মান এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।[১৯] অনুরূপ শহর ও গ্রামের ভাষিক ভিন্নতা, ধর্মীয় পেশাগত ভিন্নতা, লিঙ্গভেদ, ট্যাবু প্রভৃতি সমাজ-প্রতিবেশের পরিস্থিতিতে ভাষা ও উপভাষার অন্তরঙ্গ অবলোকন এই রীতির লক্ষ্য। সুতরাং সমাজভাষাতাত্ত্বিক রীতিতে নবাবগঞ্জের ভাষাপরিস্থিতি ও সমাজপরিস্থিতির উপরিকাঠামোসমূহ নিম্নরূপ বিষয়ের ভিত্তিতে আলোচনা করা যায়।

১. সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত রূপমূল।
২. গোত্র ও ধর্মভিত্তিক ভাষাভেদে রূপমূলের পার্থক্য।
৩. পেশাভিত্তিক ভাষাভেদে রূপমূলের পার্থক্য।
৪. লিঙ্গভিত্তিক ভাষাভেদ বা ট্যাবু।
৫. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গালিগালাজের ভাষা।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে কেন্দ্রীয় সমাজ-উপভাষার স্বরূপ নিচে দেখানো হলো।

### ৪.ক.১. সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে নবাবগঞ্জের দুই অঞ্চলের উপভাষায় ব্যবহৃত রূপমূলের পার্থক্য লক্ষণীয়। উভয় উপভাষায় বিয়ের রীতি সম্পৃক্ত কিছু রূপমূলের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো :

**গৌড়ীয় উপভাষার রূপমূল**

আয়বারি - ঘটক: যিনি পাত্র ও পাত্রী পক্ষের বিয়ের প্রস্তাব আদান প্রদান করেন।

আয়ভো - বিয়ের উপযুক্ত কুমারী।

সিয়ানা - বিয়ের উপযুক্ত যুবক।

বহুদ্যাখা - আনুষ্ঠানিকভাবে বরপক্ষের কন্যাকে দেখা।

বায়ন্যাকরা - আক্দ বা এনগেজমেন্ট করা।

থুবড়া খাওয়া - গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে মিষ্টান্ন খাওয়া।

ডুলির বিবি - মহিলা বরযাত্রী : যারা বধূবরণের জন্যে যান।

দেলমোহর - দেনমোহর।

ঘাঁটাঘিরা্যা - কন্যার বাড়ির কাছাকাছি বরের গাড়ির পথরোধ করে টাকা নেওয়া। শ্যালক সম্পর্কের যুবকরা তা করে।

দুয়ারঘিরা্যা - বরযাত্রী মহিলাদের ঘরের দরজায় রোধ করে টাকা নেওয়া। সাধারণত পাত্রীর বোন বা ভাবী সম্পর্কীয় মেয়েরা দরজা ঘেরে।

গীতগাহা - বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়েদের গান করা।

ওইল্ম্যা - বিয়ের পর বরপক্ষের দ্বারা বিয়ের অনুষ্ঠানে মিষ্টি বিতরণ।

কোলধরা - বরের দুলাভাই বা বন্ধুস্থানীয় যিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে সবসময় বরের সঙ্গে থাকেন।

কন্যাআগ্রি - নতুন বউয়ের সঙ্গে যিনি বরের বাড়িতে আসেন। সাধারণত নানী, দাদী, ভাবী বা বোন সম্পর্কীয় মহিলা সঙ্গে আসেন।

ফিরণী - বিয়ের একদিন পর কন্যাপক্ষ বরবধূকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ে আসে।

আটমোংলা - আটদিন পর আবার বরপক্ষ কন্যা ও বরকে নিয়ে আসে।

পুয়াতি - কন্যার অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। তাকে পিতৃগহে নিয়ে যাওয়া।

শাদ্ খাওয়ানা - বরের বাড়িতে অন্তঃসত্ত্বা কন্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিষ্টি, বড় রুই মাছ, বিভিন্ন ধরনের পিঠা, পান ইত্যাদি খাওয়ানো হয় এবং বধূকে বরের নিকট আত্মীয়রা শাড়ি উপহার দেয়।

ঝাল খাওয়ানা - সন্তান প্রসবের পর বরপক্ষ কন্যার বাড়িতে মিষ্টি, চাউল, আটা, গমের আটা, মসুরের ডাল, চিনি, গুড়, আদার সুটি, ছোট মুরগী ইত্যাদি পাঠায়।

আঁড়ি - বিধবা

**বরেন্দ্র উপভাষার রূপমূল**

ঘটকালি - বিয়ের প্রস্তাব আদান প্রদান।

সিয়ানা বেটি ছাওয়াল - বিয়ের উপযুক্ত যুবতী।

সিয়ানা ব্যাটা ছাওয়াল - বিয়ের উপযুক্ত যুবক।
মিয়্যা দ্যাখ্যা - বরপক্ষের কন্যা দেখা।
পানচিনি - আক্দ বা বাগদত্তা হওয়া।
ক্ষির খায়্যান্যা - গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে মিষ্টান্ন খাওয়া।
বিধি - বিয়ের আসরে মেয়েলী গীত।

অন্য রূপমূলগুলো গৌড়ীয় রূপমূলের প্রায় অনুরূপ।

**প্রাকৃতিক ও ঋতুভিত্তিক রূপমূল**

| শিষ্ট বাংলা | গৌড়ীয় | বরেন্দ্র |
|---|---|---|
| মেঘ | ম্যাগ | দ্যাওয়া |
| বর্ষা | বাস্স্যা . | বাস্স্যা |
| ঝড়বৃষ্টি | ঝাপ্টি | ঝিট্যাসি |
| শ্রাবণ | শাহন | শাহুন |
| অগ্রহায়ণ | আঘন | আঘুন |

| শিষ্ট বাংলা | গৌড়ীয় | বরেন্দ্র |
|---|---|---|
| কার্তিক | কাত্তি | ক্যাত |
| চৈত্র | চৈত | চুত |
| শুক্রবার | শুক্করবার | শোক্করবার |
| বৃহস্পতিবার | বিষ্যুদবার | বিশোদবার |
| প্রভাত | পঁহাত | বিহান |

**আত্মীয় সম্বন্ধসূচক রূপমূল**

| শিষ্ট বাংলা | গৌড়ীয় | বরেন্দ্র |
|---|---|---|
| চাচা | চাছা | চাচ্চা |
| মামা | মামু | মামু |
| জামাই | জামোই/বহনাই | জামুই |
| ফুফু | ফুপ্ফু | বেটি |
| ভাবী | ভানী | ভ্যাইজ |

| শিষ্ট বাংলা | গৌড়ীয় | বরেন্দ্র |
|---|---|---|
| বৈবাহিক | বিহ্যাই | বিয়্যাই |
| চাচাশ্বশুর | চাছাস্বসুর | চাচ্যাশ্বসুর |
| মামাশ্বাশুড়ী | মাম্যাস্বাসুড়ী | মামীস্বাসুড়ী |
| বোন | বোহিন | বুন |
| দাদা | দাদো | দাদা |

**রান্না-কৃষি ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত দ্রব্যের রূপমূল**

| শিষ্ট বাংলা | গৌড়ীয় | বরেন্দ্র |
|---|---|---|
| রান্নাঘর | হাঁশ্যাল | হাঁশ্যাল |
| থালা | থালি | থালি |
| ঢাকনা | সরপোস | ঢাকুন |
| কলস | ঠিলি | কলসী |
| চামচ | কচ্চুল | হাতা |

| শিষ্ট বাংলা | গৌড়ীয় | বরেন্দ্র |
|---|---|---|
| লাঙ্গলটানা গরু | বলদ | বল |
| গাড়ি | গাড়িহ্ | গ্যাঁড়ি |
| চাকা | পাহ্যা | পাহ্যা |
| কোদাল | কোদৌল্ | কুদাল |
| কুড়াল | কুড়হৌল্ | ক্যুড়্যাল |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| চুল্লি | আঁখা, চুলাহ্ | চুলাহ্, চুল্যা | বীজ/ধানের চারা | বিছোন্ | বিচন্ |
| ছুন্নি | ছেচ্‌কি | ছল্লি | ভুট্টা | ভুট্‌ঠা | ভটা |
| লাঙ্গল | হাল | হাল | বেগুন | বাগুন | ব্যাগোন |

**ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের রূপমূল**

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অধিকাংশ শব্দ আরবি-ফারসি ভাষা থেকে গৃহীত। তাই বিদেশি শব্দগুলোর রূপমূলগত সাদৃশ্য আছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণ বা ধ্বনিগত পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

| গৌড়ীয় | বরেন্দ্র | মূল রূপমূল | গৌড়ীয় | বরেন্দ্র | মূল রূপমূল |
|---|---|---|---|---|---|
| রযা | রুযা | রোযা | ফ্যাৎরা | ফ্যাৎরা | ফিৎরা |
| ওজুহ্ | রজু | ওজু | মিলাদ | মিলাত | মৌলুদ |
| রিদ্‌গাহা | রিদগাহা | ঈদগাহ্ | দরগাহ্ | দুরগা | দরগাহ্ |

**৪.ক.২. গোত্র ও ধর্মভিত্তিক ভাষাভেদে রূপমূলের পার্থক্য**

| মুসলমানি | হিন্দু | মুসলমানি | হিন্দু |
|---|---|---|---|
| আম্মা | মা | বেহেস্ত | স্বর্গ |
| এবাদত | উপাসনা/আরাধনা | দোযখ | নরক |
| রোযা | উপোস | পানি | জল |
| সালাম | · আদাব/নমস্কার | বোহিন | দিদি |
| আল্লাহ/খোদা | ভগবান/ঈশ্বর | ভাই | দাদা |

**৪.ক.৩. সামাজিক শ্রেণী ও পেশাভিত্তিক ভাষাভেদে রূপমূলের পার্থক্য**

পেশাগত ও শ্রেণীগত সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী সমাজকে মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন : উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। শিক্ষা, রুচি ও সংস্কৃতির কারণে তাদের ভাষাভেদ লক্ষণীয় :

| উচ্চবিত্ত | মধ্যবিত্ত | নিম্নবিত্ত |
|---|---|---|
| আব্বু | আব্বা | বাপ্পু/বাপ |
| আম্মু | আম্মা | মা |
| চাচু | চাচা | চাছা/চাচ্‌চা |
| আপু | আপা | বহিন/বুন, বুবু, বুজ্বি |

**৪.ক.৪. লিঙ্গভিত্তিক ভাষাভেদ বা ট্যাবু**

লিঙ্গভিত্তিক ভাষাভেদে উপভাষায় নয় শিষ্টভাষাতেও পার্থক্য রয়েছে। য়েসপারসন, মেরি হাস, ফিশার, সুকুমার সেন, নির্মল দাশ, শর্মিলা বসু এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাই নারীপুরুষের

বাগ্ ব্যবহারের তারতম্য কোন নতুন ব্যাপার নয়। নারীপুরুষের ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারে প্রকৃতি ও পরিমাণের দিকে দৃষ্টি দিলে উপভাষার ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য ধরা পড়ে।[২০] তাদের বাচনিক নিষিদ্ধতা (Verbal taboo), প্রবাদ (Idiom), উচ্চারণ প্রভেদ, অতিভাষিকতা (Paralinguistic features), অপ্রত্যাশিতভাব (Unexpectedness), সংজ্ঞাপনের ধরন (Patterns of communication) ইত্যাদি কারণে নারীপুরুষে ভাষাভেদ রয়েছে। নবাবগঞ্জের উপভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়। সীমিত পরিসরে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

ক. গৌড়ীয় উপভাষায় দেখা যায় সম্বোধনে স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীরা ব্যবহার করেন— হ্যাঁগে, ওঁগে, টে, রে ইত্যাদি। কিন্তু স্বামীরা ব্যবহার করেন— হ্যাঁরে, হ্যাঁবে, ওবে, ওহে, হ্যাঁহে ইত্যাদি।

খ. পৃথক পৃথক শব্দরূপ দিয়ে নারীপুরুষের বিশেষ বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়। হ্যাংলা, ট্যাপা, গোদমা, পুংটা, ভকমা, ঢ্যাপসা, ধোনধা ইত্যাদি দিয়ে পুরুষের দোষগুণ বোঝায়। নারীর দোষগুণ বোঝাতে যথাক্রমে— হেংলি, টেপি, গুদমি, পুংটি, ভোকমি, ঢ্যেপসি, ধুনধি প্রভৃতি শব্দরূপ ব্যবহৃত হয়।

গ. বাচনিক নিষিদ্ধতার জন্য নারী স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর প্রমুখের নাম উচ্চারণ না-করে নিম্নরূপে প্রকাশ করে।

স্বামী : বাড়ির মানুষ, ছ্যালার বাপ, হাঁরঘেউঁ ইত্যাদি।
শ্বশুর : বুড়হার ব্যাটা, ছ্যালার দাদো ইত্যাদি।
ভাসুর : বড়কা, ছ্যালার চাছা ইত্যাদি।

ঘ. কথায় কথায় প্রবাদ বা ছড়া কাটার প্রবণতাও নারীর বেশি। যেমন—

১. ভাতার আলির ভাতার আছে আঁড়ির আল্লাহ্ আছে।
২. সারাদিন আলে ভালে র‍্যাতে আস্যা মরিচ ডলে।
৩. বুঢ়াতে বুঢ়াতে কথা কহে সব কথাতে কাসি,
ছুঢ়াতে ছুঢ়াতে কথা কহে সব কথাতে হাসি।

### ৪.ক.৫. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম ও গালিগালাজের ভাষা

শিষ্ট বাংলার সঙ্গে গৌড়ীয় ও বরেন্দ্র উপভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামের পার্থক্য নিম্নরূপ :

| শিষ্ট বাংলা | গৌড়ীয় উপভাষা | বরেন্দ্র উপভাষা |
|---|---|---|
| হাতে | হাথে | হাতোত |
| পেটে | প্যাটে | প্যাটোত |
| বুকে | বুখে | বুকোত |
| নখে | লোখে | কুনিত |
| পায়ে | পাথে | পায়োত/ভোড়ত |
| শরীরে | গতরে | গায়োত |

### গালিগালাজের ভাষা

"গালাগাল ভাষা-নির্ভর নয়, সংস্কৃতি-নির্ভর। অর্থাৎ কোন কথাটা গাল আর কোন্‌টা গালাগাল নয় তা বিশেষ সংস্কৃতির দ্বারা, এমন কি বিশেষ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"[২১] সুতরাং গালাগালির ধরন দেখেও সামাজিক পরিস্থিতি ও জাতির মনস্তাত্ত্বিক পরিচিতি পাওয়া যায়। গালি যেমন অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের ভাষা তেমনি মানসিক উত্তেজনা প্রশমনের একটি প্রক্রিয়াও বটে। গালাগালের শব্দগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

১. অবজ্ঞাসূচক গালাগাল; ২. ইচ্ছা প্রকাশক গালাগাল; ৩. অবৈধ যৌন সম্পর্ক বিষয়ক গালাগাল; ৪. মেটাফোর নির্ভর গালাগাল ইত্যাদি। উপযুক্ত শ্রেণী অনুযায়ী নবাবগঞ্জ জেলার গালাগালের ভাষার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নে দেওয়া হলো :

### ১. অবজ্ঞাসূচক গালাগাল

অবজ্ঞাসূচক গালাগালে সাধারণত নামের বিকৃত উচ্চারণ এবং দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দোষ নির্ধারণ করে বিশেষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন— রশিদ > রশ্যা, মফিজ > মফ্যা, সুলতান > স্যুলত্যান্যা ইত্যাদি। দোষ চিহ্নিত শব্দ দ্বারা গালি হিসেবে কমবুদ্ধির মানুষকে হকমা গাঁড়োল, ধুন্ধা, হুঁশমোটা ইত্যাদি; পেটমোটা লোককে ঢাবা, ট্যাপা ইত্যাদি বলা হয়।

### ২. ইচ্ছা প্রকাশক গালাগাল

ক. তোর মুখে মুদ্‌বো। খ. সালার পাছার চামড়া তুলবো। গ. সালির ক্যাঁস্যাল ছুটিয়্যা দিবো।

### ৩. অবৈধ যৌনসম্পর্ক বিষয়ক গালাগাল

ক. হারামির বাচ্চা হারামি। খ. গোলামের ব্যাটা গোলাম। গ. বেজন্মার ব্যাটা বেজন্মা। ঘ. জারুয়ার ব্যাটা। ঙ. হাঁটকুড়ার ব্যাটা।

### ৪. মেটাফোর নির্ভর গালাগাল

ক. পচা আদার ঝাল বেশি (কালো মেয়ের অহংকার বেশি)। খ. গুড়ের জিলাপি (কালো মেয়ে)। গ. ঝুনা লারকেল (বয়স্কা মেয়ে) ইত্যাদি।

### ৪.খ. রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

নবাবগঞ্জ জেলার উপভাষা বৈচিত্র্যের মধ্যে গৌড়ীয় উপভাষা ও বরেন্দ্র উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ। সীমিত পরিসরে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্ব নিয়ে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো।

### ৪.খ. ১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

### ক. স্বরধ্বনি

আদর্শ শিষ্ট বাংলা ভাষার মূলস্বরধ্বনি বা Phoneme-এর মতো /ই/,/এ/,/এ্যা/, /ও/ এবং /উ/ স্বরধ্বনির প্রয়োগ নবাবগঞ্জের উপভাষাতেও রয়েছে। নিম্নে স্বরধ্বনির অবস্থান অনুযায়ী রূপমূল তালিকা ও তার প্রয়োগ দেখান হলো :

| মূল স্বরধ্বনি | রূপমূলের আদিতে | রূপমূলের মধ্যে | রূপমূলের অন্তে |
|---|---|---|---|
| /ই/ | ইন্দারা (ইদাঁরা)<br>ইলস্যা (ইলিশ) | কিল্‌কিল্যা (লোভী)<br>কিন্যা (ক্রয়)<br>ঢিল্যা (অলস) | বকরি (ছাগল)<br>বিয়ানি (প্রসবকারিণী)<br>উড়ানি (উচ্ছনে মেয়ে) |
| /এ/ | এগল্যা, এট্যা, এঠে, এখনি | যেঠেসেঠে (যেখানে সেখানে)<br>যেগ্‌ল্যা (যেগুলো) | কহে (বলে)<br>বুলে (বলে)<br>হাঁকে (আমাকে)<br>ওহে (সম্বোধন অর্থে) |
| /এ্যা/ | এ্যাক, এ্যাখন, এ্যারঘে | ক্যালা, ত্যাল, ব্যাল | গোবিয়্যা (মেরে)<br>ধোর‍্যা (ধরে)<br>থুএ্যা (রেখে) |
| /আ/ | আগাল্‌ছে (এগিয়েছে)<br>আস্যাছে (এসেছে) | ভাগ্‌ন্যা (ভাগ্নে)<br>হামরাকে (আমাদের) | ধড়অ্যা (পাঁচসের)<br>ধকড়া (পাপোস)<br>রহা (দাঁড়া), সহা (বক্স) |
| /অ/ | অরঘে (ওদের)<br>অগ্‌রে (ওদের), অঘা (দুর্বল) | জখা (মাপ)<br>খজা (নপুংসক) | 'অ' ধ্বনির প্রয়োগ নাই |
| /উ/ | উসরা (বারান্দা)<br>উগ্‌লা (ঔগুলো) | আউড় (খড়)<br>হুউড়কা (খিল) | হাঁকাউ (তাড়াও)<br>ধুলু (সাদা), ফাউ |
| /ও/ | ওরাকে (ওদের)<br>ওলান (গাভীর বাট) | চোঙ্গা, ঢোলা, চোলাহ্ | থাকো, থামহো,<br>খাড়াও কহো |

ড. আবদুর রহীম খোন্দকার দেখিয়েছেন, গৌড়ীয় উপভাষায় মূল স্বরধ্বনিগুলোর বাক প্রবাহের ক্ষেত্রে নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ পরিবর্তনই স্বরসংগতির নিয়ম অনুসারে হয়।[২২] যেমন :

১. আদি এবং অন্তে /এ/ স্বরধ্বনি নবাবগঞ্জের উপভাষায় /এ্যা/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন— আদিতে: তেল > ত্যাল, কলা > ক্যালা, মেঘ > ম্যাঘ, বেল > ব্যাল, বেচা > ব্যাচা ইত্যাদি। অন্তে: রেখে > রাখ্যা, বলে > বল্যা, কহ্যা, গেয়ে > গাহ্যা, দেখে > দেখ্যা ইত্যাদি।

২. কখনো আদি /ই/ ধ্বনি এই উপভাষায় /এ/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন— লিচু > লেচু, ইঁদুর > এন্দুর ইত্যাদি। আবার কখনো কখনো /এ/ ধ্বনি /ই/ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— সেলাই > সিলাই, শেখা > শিখ্যা, ঢেকি > ঢিঁকি, গেলা > গিল্যা ইত্যাদি।

৩. আদি /ও/ ধ্বনি /উ/ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— তোমার > তুমার, সোজা > সুজা, ছোঁড়া > ছুঁড়া ইত্যাদি।

৪. বাংলাদেশের অন্যান্য উপভাষার মতো নবাবগঞ্জের উপভাষায় অপিনিহিতির রূপ এক নয়। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ উপভাষায় অপিনিহিতি 'ই' ধ্বনির যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষণীয়।[২৩] কিন্তু নবাবগঞ্জের বা রাজশাহীর উপভাষার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম সম্পর্কে দুজন

গবেষক মন্তব্য করেছেন। নবাবগঞ্জের উপভাষার অপিনিহিতি প্রসঙ্গে ড. আবদুর রহীম খোন্দকার বলেছেন, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের মতো এই উপভাষার অপিনিহিতি নয়। এই উপভাষার উচ্চারণে প্রচলিত অপিনিহিতিকে অর্ধ অপিনিহিতি (Half Epenthesis) বলা যেতে পারে।[২৪] এমন কি রাজশাহীর উপভাষাতেও এই রূপের পার্থক্য আছে। এই প্রসঙ্গে ড. পি. এম. সফিকুল ইসলাম বলেছেন, গৌড়ীয় উপভাষার মত রাজশাহীর ভাষায় অর্ধঅপিনিহিতির প্রয়োগ হয়নি।[২৫] আমরা লক্ষ করতে পারি, নবাবগঞ্জের গৌড়ীয় উপভাষা ও বরেন্দ্র উপভাষায় অপিনিহিতির ক্ষেত্রে অনুরূপ পার্থক্য আছে। যেখানে গৌড়ীয় উপভাষায় কহ্যাছিল, খায়্যাছিল, করা্যাছিল ব্যবহৃত হয় সেখানে বরেন্দ্র অঞ্চলের উপভাষায় ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে বুলিচিল, করিচিল, খাচিল ইত্যাদি।

৫. নবাবগঞ্জের উপভাষায় দ্বিস্বর ধ্বনি (Dipthongs)-র ব্যবহার নিম্নরূপ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| এ ই (ei) | যেই, সেই | অ য় (a y) | লয় (নয়), ভয় |
| ও ই (oi) | কই, সই (সখি) | আ য় (a:y) | পাছায়, আদায় |
| আ ই (ai) | হাই, লাই (প্রশ্রয়) | এ উ (eu) | ফেউ, ঢেউ, সেউ |
| উ ই (ui) | থুই (রাখি), পুঁই | আ উ (a:u) | জাউ, ফাউ |
| আ ও (ao) | লাও (নৌকা), ফাও (বিনামূল্যে বিতরণ) | ই ও (eo) | লিও, দিও |
| এ্যা য় (ae o) | ল্যাও, খ্যাও, দ্যাও | ই উ (eu) | লিমু, দিম (বরেন্দ্র ভাষায়) |
| এ্যা য় (ae y) | ল্যায়, দ্যায় | অ এ্যা (oae) | বস্যা, দয়্যা ইত্যাদি |

**খ. ব্যঞ্জনধ্বনি**

১. মধ্য বাংলর মত গৌড়ীয় ও বরেন্দ্র উপভাষায় 'ঢ়' এর ব্যবহার রক্ষিত। মধ্য বাংলা থেকে আধুনিক বাংলায় ঢ় > ড়-তে পরিণত হয়েছে। যেমন— পঢ়া > পড়া, বুঢ়া > বুড়া ইত্যাদি। অথচ এই উপভাষায় 'ঢ়' ধ্বনি এখনও রক্ষিত। যেমন— দাঢ়ী < দাড়ী, গাঢ়ী < গাড়ী, বাঢ়ী < বাড়ি ইত্যাদি।

২. পদান্তস্থিত 'হ'-কার ধ্বনি আধুনিক বাংলায় লুপ্ত হলেও নবাবগঞ্জের উপভাষায় এখনও রক্ষিত। যেমন— বারহ > বারো, তেরহ > তেরো, পনেরোহ > পনের, ষোলহ > ষোল ইত্যাদি মধ্য বাংলার 'হ'-কার দেখা যায়। আবার পদমধ্যবর্তী 'হ'-কারের ব্যবহারও প্রাচীন ও মধ্যবাংলার মতো। যেমন— মহাকাল > মাকাল ইত্যাদি।

৩. কখনো কখনো 'হ' ধ্বনির আগম ঘটে। যেমন— গম > গহম, ছোলা > ছোলাহ, পাড় > পাহাড়, জোলা > জোল্‌হা, ছায়া > ছাঁয়হ্যা ইত্যাদি।

৪. কোন কোন পদে 'হ' ধ্বনি বিশ্লিষ্ট রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— কাঁঠাল > কাঁহটাল; কিন্তু বরেন্দ্রর উপভাষায় উচ্চারিত হয়— কাঁঠাল > কাঁঠোল।

৫. শব্দের আদিতে 'ন' নবাবগঞ্জের উপভাষায় 'ল' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন— নৌকা > লৌকা, নদী > লদী, নষ্ট > লষ্ট। আবার কখনও শব্দের আদিতে 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন— লবণ > নুন, লেবু > নেবু, লাগাল > নাঘাল।

৬. শব্দের আদিতে 'র' ধ্বনি লুপ্ত হয়। যেমন— রসুন > অসুন, রোববার > অববার, রাখাল > আখাল।

৭. পদান্ত 'ক' ধ্বনি 'গ' তে পরিণত হয় এবং পদান্ত 'ঘ' ধ্বনি 'গ'তে পরিণত হয়। যেমন— শাক > শাগ্‌, বক > বগ্‌, বাঘ > বাগ ইত্যাদি। যদিও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাপ্রাণঘোষবর্ণ ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণের কথা বলেছেন।[২৬] কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। গৌড়ীয় উপভাষার 'ঝ' ধ্বনিরূপ এবং বরেন্দ্র উপভাষায় 'জ' ধ্বনিরূপ প্রচলিত। যেমন— এ্যাকঝন > এ্যাকজুন।

৮. গৌড়ীয় উপভাষায় শুধুই 'স' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন— শীত > সীত, শিয়াল > সিয়াল, শ্বশুর > স্বসুর ইত্যাদি। কিন্তু এই জেলার বরেন্দ্র উপভাষায় 'শ' এবং 'স' ধ্বনির ব্যবহার বেশি হলেও 'ষ' ধ্বনির ব্যবহার নেই।

৯. কোন কোন ক্ষেত্রে 'ব' এর উচ্চারণ 'ভ' হয়। যেমন— জবাই > জভাই, যাবো > যাভো।

### ৪.খ.২. রূপতত্ত্ব (Morphology)

নববাগঞ্জ জেলায় প্রচলিত গৌড়ীয় ও বরেন্দ্র উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. এই জেলার উপভাষায় বিভাজিত রূপমূল, সহরূপমূল, মুক্তরূপমূল এবং বদ্ধরূপমূলের বিশেষ রীতি লক্ষণীয়। যেমন—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক. | গৌড়ীয় উপভাষায় বিভাজিত রূপমূল | মায়্যাছ্যালা | (মেয়ে) |
| | | স্যাজকোল্‌ | (সেজো) |
| | বরেন্দ্র উপভাষায় বিভাজিত রূপমূল | বেটিছাওয়াল | (মেয়ে) |
| | | স্যাঁঝলা | (সেজো) |
| খ. | গৌ. উপভাষায় সহরূপমূল | গুলাহ্‌ | (গুলো) |
| | | রাকে | (দের) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ব. উপভাষায় সহরূপমূল | গুল্যান | (গুলো) |
| | | হেরে, গেরে | (দের) |
| গ. | গৌ. উপভাষায় মুক্ত রূপমূল | ঘাঁটা | (রাস্তা) |
| | | গতর | (শরীর) |
| | ব. উপভাষায় মুক্ত রূপমূল | ঘাঁটা | (রাস্তা) |
| | | গাও | (শরীর) |
| ঘ. | গৌ. উপভাষায় বদ্ধ রূপমূল | মায়্যাছ্যালাগুলাহ | (মেয়েগুলো) |
| | | গতরখাটা | (শরীরিক শ্রম) |
| | ব. উপভাষায় বদ্ধ রূপমূল | বেটিছাওয়ালেরা | (মেয়েগুলো) |
| | | গাওখাটা | (শারীরিক শ্রম) |

২. নবাবগঞ্জ জেলার উপভাষায় সম্প্রসারিত রূপমূলের বিশেষ রূপ লক্ষ করা যায়। যেমন—

| | |
|---|---|
| গৌ. উ. ভা. | কহি, কহ্যাছি, কহ্যাছিনু। |
| ব. উ. ভা. | বুলি, বুলিচি, বুলিচিনু। |

৩. কর্ম ও সম্প্রদান কারকের সর্বনামের বহুবচনে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। যেমন—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| গৌ. উ. ভা. | একবচনে | হামি | > | হামাকে |
| | বহুবচনে | হামরা | > | হামরাকে, হামরাখে |
| ব. উ. ভা. | একবচনে | হামি | > | হামাক |
| | বহুবচনে | হাক্ষরা | > | হাক্ষাঘেরে, হাক্ষাগেরে। |

৪. অপাদান কারকেও বচন ও পুরুষ অনুযায়ী ভিন্ন রূপ হয়। যেমন—

| | |
|---|---|
| গৌ. উ. ভা. উত্তম পুরুষ একবচনে | হামার থাক্যা |
| গৌ. উ. ভা. উত্তম পুরুষ বহুবচনে | হামারঘে থাক্যা। |
| ব. উ. ভা. উত্তম পুরুষ একবচনে | হামার থিনি |
| ব. উ. ভা. উত্তম পুরুষ বহুবচনে | হাক্ষাহেরে থিনি। |

৫. কর্তা ও কর্মের সম্মানভেদে এই উপভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ ভিন্নতা পায়। যেমন—

গৌ. উ. ভা : কহেন < বলেন, চল্‌হেন < চলুন, কহো < বলো, চলহো < চলো।

ব. উ. ভা : বুলেন < বলেন, চলেন < চলুন, চলেন, বুলো < বলো, চলো < চলো।

৬. এই জেলার উপভাষায় দের, দিগের, দিগকে বিভক্তি অজ্ঞাত। বরং বহুবচনে গৌড়ীয় ও বরেন্দ্র উপভাষায় নিম্নরূপ বিভক্তি প্রচলিত। যেমন—

গৌ. উ. ভা. : রাকে, রঘে, গুলাহ প্রভৃতি। তোরাকে, হামরাকে, ওরঘে, গাছগুলাহ্ ইত্যাদি।

ব. উ. ভা. : গেরে, রে, গুল্যা প্রভৃতি। তোগরে, হাক্ষাগেরে, ওগরে, গাচ্‌গুল্যা ইত্যাদি।

৭. গৌড়ীয় ও বরেন্দ্র উপভাষায় সম্বোধনের পৃথক রূপ প্রচলিত। যেমন—

| | | |
|---|---|---|
| গৌ. উ. ভা. | পুং লিঙ্গ | বাপহে, চাছাহে, নানাহে, বাপুজি, চাছাজ্বি, দাদোজ্বি |
| | স্ত্রী লিঙ্গ | মাগে, চাছীগে, নানীগে, দাদীগে। |
| ব. উ. ভা. | পুং লিঙ্গ | বাগে, চাচাগে, নানাগে, দাদাগে। |
| | স্ত্রী লিঙ্গ | মারো, চাচীরো, নানীরো, দাদীরো। |

### ৪.খ. ৩. বাক্যতত্ত্ব (Syntax)

বাক্য মূলত কতকগুলো রূপমূলের সমষ্টি। রূপমূলগুলোকে বৃহত্তর এককে যুক্ত করার বিশেষ রীতি বা নিয়মকেই বলা হয় বাক্যতত্ত্ব। নবাবগঞ্জ জেলার উপভাষায় ব্যবহৃত রূপমূলের গঠন ও বিন্যাসের সূত্রসমূহ বিশ্লেষণ করলে বাক্যরীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে সাংগঠনিক ও উৎপাদনী বাক্যতত্ত্বের কয়েকটি রীতির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মেও অনুসন্ধান করা হবে।

গৌড়ীয় উপভাষা : বুঢ়ালোখটা ছোটছ্যালাটাখে মার‍্যাছে।

শিষ্ট বাংলা বৃদ্ধ লোকটি ছোট ছেলেটিকে মেরেছে।

উপভাষার রূপমূলগুলো এরকম : বুঢ়লোখটা = বুঢ়া + লোখ + টা, ছোট ছ্যালাটাখে = ছোট + ছ্যালা + টাকে, মার‍্যাছে = মার + আছে। এখানে বুঢ়ালোকটা এবং ছোটছ্যালা সমশ্রেণীর উপাদান এবং মার‍্যাছে ভিন্ন শ্রেণীর উপাদান। অর্থাৎ বাক্যটির উপাদানসমূহ হচ্ছে :

বিশেষণ + বিশেষ্য বাক্যাংশ + বিশেষণ + বিশেষ্য বাক্যাংশ + ক্রিয়া বাক্যাংশ।

আবার টা এবং খে দ্বারা লোখ ও ছ্যাল্যা পরস্পরের প্রতিস্থাপনে ভিন্ন উপাদানরূপে ব্যবহৃত। বন্ধনীর সাহায্যে বাক্যটির উপাদনীয় গঠন নিম্নরূপে নির্দেশ করা যায়:

(((বুঢ়লোক) (টা) ((ছোটছ্যাল্যা) (টা) (খে) (মার‍্যাছে)))

অর্থাৎ এখানে বিশেষণ, বিশেষ্য বাক্যাংশ বিশেষ্য, বিশেষণ, বিশেষ্য বিশেষ্য উত্তরপদ বাক্যাংশ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যটির উদাহরণ চিত্রের সাহায্যে দেখান হলো :

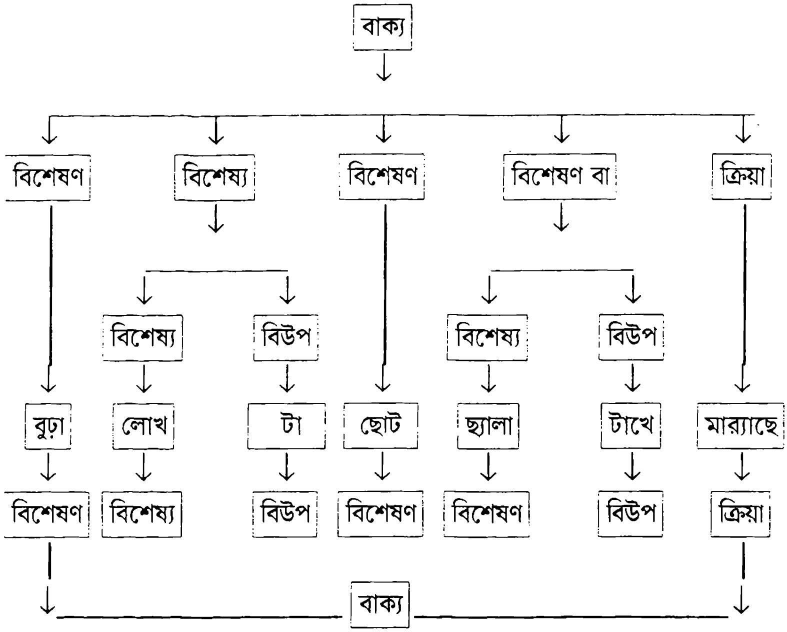


প্রচলিত ব্যাকরণ অনুযায়ী জেলার উপভাষার নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায় :

১. বাক্যগঠন রীতি নিম্নরূপ :

| কর্তা | অসমাপিকা | করণ | অধিকরণ | গৌণকর্ম | মুখ্যকর্ম | ক্রিয়া |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হাশেম | - | - | ঢাকাতে | - | ব্যবসা | করে |
| রহিম | - | - | ইস্‌কুলে | পড়িতে | - | যায় |
| কুবের | সূন্যাটুন্যা | লৌকাতে | ময়না দ্বীপে | রওয়ানা | - | হ্যালো |

২. নঞর্থক বাক্যে 'না' বা 'নাই' শিষ্ট বাংলার মতই ক্রিয়াপদের পরে বসে। তবে সম্ভাবক বিধিভাবে 'না' ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যেমন— 'না আস্যা তুই ভালই কর‍্যাছিস'।

৩. পদ সংযোজনে 'না' নামপদের পূর্বে বসে। যেমন— 'না হামি না তুমি কেহুই কুনু কথা কহ্‌বো না'।

৪. বিশেষ্য বাক্যাংশ ও ক্রিয়াবাক্যাংশের গঠন প্রায় শিষ্ট বাংলার মত। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

বিশেষ্য বাক্যাংশ : ১. লদীহোনে (নদী থেকে), ২. ছ্যালারঘে ল্যাগ্যা (ছেলেদের জন্য), ৩. লিজেরলাতে (নিজের নৌকায়), ৪. অন্ধারর‍্যাতে (অন্ধকার রাতে)।

ক্রিয়া বাক্যাংশ : ১. লাহ্যাব্যার ল্যাগা (গোসলের জন্য), ২. আন্ধ্যাছিনু (রান্না করে ছিলাম), ৩. পুছ্‌তে (জিজ্ঞেস করতে), ৪. ঠাহর‍্যাতে (অনুভব করতে)।

৫. এই উপভাষায় অধিকরণ কারকে 'ত', 'তে', অপাদান কারকে 'হতে', 'হোঁতে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— বাড়তে কাম আছে (অর্থাৎ বাড়িতে কাজ আছে), লদীতে মাছ আছে, রোহনপুর হোনে ট্রেরেন ছ্যাড়্যাছে, বাড়ি হোঁতে বাজার পন্‌যোত চলো। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দেখিয়েছেন, 'ত' বিভক্তি মুণ্ডা ভাষাতেও লক্ষ করা যায়। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রামের ভাষার, আসামী ভাষায় 'ত' বিভক্তি ('তে' নাই) প্রচলিত বলে অভিমত দিয়েছেন।[২৭] কিন্তু নবাবগঞ্জের উপভাষায় 'তে' এবং 'ত' বিভক্তির প্রচলন আছে।

৬. নবাবগঞ্জের উপভাষাতেও শব্দদ্বৈতের প্রয়োগবাহুল্য লক্ষণীয়। যেমন— আঁহিডাঁহি (ছটফট করা), ভ্যাকর ভ্যাকর (বকবক করা), লটরপটর (ধীরে ধীরে), লোটিয়া-ঘোটিয়া (কোন রকমে), সিধ্যাসিধি (সোজাসুজি), ঘিনঘিন্যা (ঘৃণ্য) ইত্যাদি।

**৪. খ.৪. শব্দকোষ (Lexicon)**

আদর্শ শিষ্ট বাংলা ভাষার মতই নবাবগঞ্জের উপভাষাতেও তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দ রয়েছে। তবে এই উপভাষায় হিন্দি, পারসি ভাষার রূপমূল বহুলব্যবহৃত। সে তুলনায় তৎসম শব্দের ব্যবহার কম। এছাড়াও এই উপভাষার নিজস্ব রূপমূল রয়েছে। নিচে বিভিন্ন প্রকার শব্দকোষের তালিকা দেওয়া হলো :

**ক. তৎসম শব্দ**

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের উপভাষার মত নবাবগঞ্জের উপভাষাতেও তৎসম শব্দের ব্যবহার খুব কম। তৎসম শব্দগুলো ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। তবে কিছু কিছু তৎসম শব্দ এই উপভাষাতেও শুদ্ধভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন— বাহু, বন্ধু, বিষ, বল, বন, ছাত্র, পাত্র, শক্তি (সক্তি), যুদ্ধ, সুখ, স্বাস্থ্য, ভাগ্য, আকাশ, কৃষ্ণ ইত্যাদি।

**খ. অর্ধ-তৎসম শব্দ**

'বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ সংকলন'-এ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "বাঙ্গালা ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ তাহার বিশুদ্ধ রূপটি অব্যাহত রাখিতে পারে নাই, লোক মুখে তাহার বিকার ঘটিয়াছে।"[২৮] আঞ্চলিক বা গ্রাম্য-শব্দগুলোতে তৎসম শব্দের বিভিন্ন রূপ লক্ষ করা যায়। শব্দের এই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের রূপটি নবাবগঞ্জের উপভাষাতেও লক্ষণীয়। এগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দরূপে নির্দেশ করা যায়। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া হলো :

| তৎসম শব্দ | উপভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দ |
|---|---|
| উন্দুর, উন্দর | এন্দুর |
| শীতল | হিয়াল |
| ঠাণ্ডা | ঠার |
| আস্ফালন | আঁখলান্যা |
| নিদ্রা | নিন, নিদ |

| তৎসম শব্দ | উপভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দ |
|---|---|
| ক্ষুধা | ক্ষিধ্যা |
| কৃষাণ | কিষ্যান |
| শরীর | শরীল |
| দয়া | দয়্যা |
| | |

**গ. তদ্ভব শব্দ**

আদর্শ চলিত বাংলায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দগুলো প্রায়ই এই উপভাষায় অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন— ওঝা, কামার, সাঁঝ, কলা, মূলা, লাউ, উট, আলতা ইত্যাদি। কিন্তু যেসব শব্দ এই উপভাষায় পরিবর্তিত হয়েছে, সেইসব শব্দের ব্যুৎপত্তিসহ একটি নমুনা তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

**আর্য থেকে গৃহীত শব্দ**

| প্রাঃ ভাঃ আর্য | মধ্যঃ ভাঃ আর্য | শিষ্ট বাংলা | উপভাষা |
|---|---|---|---|
| গায়তি | গাঅই | গায় | গাহে |
| ইন্দ্রাগার | ইন্দাআর | ইঁদারা | ইন্দারা |
| অর্ধ তৃতীয় | অড্ঢতইঅ | আড়াই | আঢ়াই |
| পঞ্চদশ | পন্দরস | পনর | পনেরহ |
| ষোড়শ | সোলস | ষোল | ষোলহ |

**দ্রাবিড় থেকে গৃহীত শব্দ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| মুটক | মুডক | মোট, মুটে | মুটে |
| ইঞ্চক | ইঞ্চঅ | ইঁচলা | ইঁচল্যা |
| কুলকম | কুটপ | কুড়ব | কুটাহ্ |

**অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে গৃহীত শব্দ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| টঙ্ক | টঙ্ক | টং | টং |
| ঢৌকয়াত | ঢুক্কাই | ঢোকে | ঢুকে |

**বিদেশি শব্দ থেকে গৃহীত**

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাঙালি বহু বিদেশি জাতি ও বাচক গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসে। ফলে আমাদের শিষ্ট বাংলার মত উপভাষাতেও বিদেশি শব্দের আগমন ঘটে। এর মধ্যে আছে— ১. আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দ; ২. পর্তুগিজ শব্দ; ৩. ইংরেজি শব্দ; ৪. ওলন্দাজ ও ফরাসি শব্দ; ৫. হিন্দি ও বিহারি শব্দ। উল্লিখিত বিদেশি ভাষাসমূহের রূপমূল নবাবগঞ্জের উপভাষায় কখনো অবিকৃত, কখনো কিঞ্চিৎ বিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো :

### ১. আরবি-ফারসি-তুর্কি থেকে গৃহীত শব্দ

কেবল বিবর্তিত শব্দসমূহের তালিকা দেওয়া হলো

| অ.ফা.তু. ভা. | শি. বা. ভা. | ন. উ. ভা. |
|---|---|---|
| আজবক | উজবক | উজবুক |
| কিনার | কিনার | কান্হা, কিন্যার |
| খোশা | খোশা | খুশা, চোকা |
| জেয়াফত | জেয়াফত | জাফত |
| বেবক | বেবাক | ব্যাক, ব্যাবাক |

| অ. ফা. তু. ভা. | শি. বা. ভা. | ন. উ. ভা. |
|---|---|---|
| লোকসান | লোকসান | লস্ |
| ওসিয়াত | ওসিয়ত | ওসিহত |
| মোরগ | মোরগ | মুরগা |
| খেসারত | খেসারত | খ্যাসারত |
| ওয়াজ | ওয়াজ | ওজ্ ইত্যাদি |

### ২. পর্তুগিজ থেকে গৃহীত শব্দ

শিষ্ট বাংলায় গৃহীত পর্তুগীজ শব্দগুলোও নবাবগঞ্জের উপভাষায় যথাযথ এবং বিকৃত দুইভাগে গহীত হয়ছে। যেমন :

| শিষ্ট বাংলা | নবাবগঞ্জের উপভাষা |
|---|---|
| নোনা | লোনা > ল্যুন্ঠা |
| তোয়ালিয়া | তয়ল্যা |
| বোতল | বোতল |
| পেঁপে | পিপিঅ্যাঁ |
| আলকাতরা | আলকাতরা |
| বালতি | বালতি |
| আতা | আতা |
| পিরিচ | প্রিচ |
| বর্গা | বর্গা |

| শিষ্ট বাংলা | নবাবগঞ্জের উপভাষা |
|---|---|
| সাবান | সাবুন |
| নীলাম | লীলাম |
| চাবি | চাব্হি |
| কাবার | কাবাড় |
| বয়াম | বৈয়ম |
| ব্যান্ডেল | বান্ডিল |
| তামাকু | তামুক |
| জানালা | জানলা, খিড়কি (হিঃ) |
| | |

### ৩. ওলন্দাজ ও ফরাসি শব্দ

শিষ্ট বাংলার মত এই উপভাষাতেও ওলন্দাজ এবং ফরাসি শব্দসমূহ গৃহীত হয়েছে। এইসব বিকৃতি অপেক্ষাকৃত কম। যেমন— হরতন, রুইতন, তুরুপ, ওমলেট ইত্যাদি! তবে এই উপভাষায় ওলন্দাজ ও ফরাসি শব্দের ব্যবহার খুব কম।

### ৪. ইংরেজি থেকে গৃহীত শব্দ

উপভাষায় ইংরেজি শব্দগুলো এসেছে মূলত শিষ্ট বাংলা থেকে। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। নিচে কিছু শব্দের নমুনা দেওয়া হলো।

| শিষ্ট বাংলা | নবাবগঞ্জের উপভাষা |
|---|---|
| গ্লাস | গিল্যাস |
| প্যান্ট | প্যান |
| পেন্সিল | পিনসিল, পেনসিল |
| টেবল, টেবিল | টেবল |
| লর্ড, লাট | লাট |
| বক্স | বাক্‌সো |
| ইলেকশন | ইলিকসান |
| ট্রেন | টেরেন |
| রিফিউজি | রিফুজি |

| শিষ্ট বাংলা | নবাবগঞ্জের উপভাষা |
|---|---|
| মাইক | ম্যাক্ |
| টিকেট | টিকিট |
| লাইট | ল্যাট |
| কন্ট্রোল | কনটোল |
| ক্যাম্প | ক্যাম্ |
| কারফিউ | কার্‌ফি |
| সাইকেল | সাইকোল |
| ম্যাজিস্ট্রেট | ম্যাস্‌টেট ইত্যাদি। |
| | |

## ৫. হিন্দি ও বিহারি শব্দ

নবাবগঞ্জ একদা বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকায় এই উপভাষায় হিন্দি ও বিহারি ভাষার শব্দের আধিক্য লক্ষণীয়। নিচে নমুনা তালিকা দেওয়া হলো :

| হিন্দি ও বিহারি শব্দ | বাংলা অর্থ | নবাবগঞ্জের উপভাষা |
|---|---|---|
| কাঁহা | (কোথায়) | কাঁহা |
| বহিন | (বোন) | বহিন |
| নাদান | (নির্বোধ) | লাদান |
| বেত্তমিজ | (অশিষ্ট) | বৈত্যাল, বেহুদা |
| হুঁশ | (জ্ঞান) | হুঁশ |
| রুখো | (থাম) | রুখ্, রহা, রহ্ |
| থোড়াহ্ | (অল্প) | থোড়া |
| খিড়কি | (জানালা) | খিড়কি |
| গতর | (শরীর) | গতর |
| তিল্লি | (খাসির যকৃত) | তিল্লিহ্ |
| লক্‌ড়ী | (খড়ি, জ্বালানী) | লক্‌ড়ী |
| চিরাগ | (প্রদীপ) | চ্যারাগ |

| হিন্দি ও বিহারি শব্দ | বাংলা অর্থ | নবাবগঞ্জের উপভাষা |
|---|---|---|
| ডর | (ভয়) | ডর |
| প্যাজ | (পিয়াজ) | প্যাজ |
| সেব্ | (আপেল) | সেপ্ |
| দিমাগ | (মাথা) | দেমাগ |
| দহী | (দই) | দহী |
| কুহনী | (কনুই) | কুহনী |
| খীরা | (শশা) | ক্ষীর্যা |
| আণ্ডা | (ডিম) | আণ্ডা |
| পোতা | (দৌহিত্র, নাতী) | পোতা |
| ভৈস্ | (মহিষ) | ভৈস্ |
| ডাহিন্ | (ডান, দক্ষিণ) | ডাহিন |
| গুংগা | (বোবা) | গোংগা |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| দেহড়ী | (চৌকাঠ) | দেহড়ী | গোদ | (কোল) | গোদ |
| সীধা | (সোজা) | সীধা | চুল্হা | (চুল্লী) | চুল্হা |
| ঝুঠ | (মিথ্যা) | ঝুঠা | প্যায়সা | (পয়সা) | পায়স্যা |
| কুদ্না | (লাফানো) | কুদ্ | বুখার | (জ্বর) | বুখার |

**নবাবগঞ্জের উপভাষার নিজস্ব রূপমূল**

দেশি-বিদেশি শব্দ ছাড়াও নবাবগঞ্জের উপভাষার নিজস্ব কিছু রূপমূল আছে। নিম্নে তার একটি নমুনা দেওয়া হলো :

| নবাবগঞ্জের উপভাষা | শিষ্ট বাংলা | নবাবগঞ্জের উপভাষা | শিষ্ট বাংলা |
|---|---|---|---|
| আহোটি (গৌ. ক্রি.) | ক্রোধ প্রকাশ করা | ছ্যান্হা (বিন.) | ছিদ্র |
| আকাম (গৌ. ক্রি.) | ক্ষতি করা | হাঁন্ঠ্যা (বিন) | রাগী |
| এ্যাকঠে (ক্রি. বিন) | একত্রে | সহ্লিয়া (ক্রি) | আদর করে |
| এ্যাকঘুড়ি (ক্রি. বিন) | এক মুহূর্তে | অ্যাড় (বি.) | খড়, আউড় |
| গিথ্যান (বি.) | গৃহিণী, গিন্নি | ম্যাটরা (বিন.) | মোটা |
| গুমানি (বিন.) | অহংকারী | আপাস (ক্রি.) | আছাড় দিয়ে ফেলা |
| পোঁটা (বি.) | নাকের সর্দি | খোলহ্যান (বি.) | খামার |
| হুড়কা (বি.) | খিল | তাঁহিস (ক্রি.) | অত্যাচার, ইত্যাদি |

বস্তুত বর্তমান আলোচনায় গৌড়ীয় উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক রূপ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলেও অন্য উপভাষাগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণই রইল। এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা হলে সামগ্রিকভাবে নবাবগঞ্জ জেলার উপভাষা বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া সম্ভব।

**তথ্যনির্দেশ ও টীকা**


১. নূরুল ইসলাম খান (সম্পাদিত) *বৃহত্তর রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ার*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪১৪

২. *Zilla Statistics, Rajshahi*, 1987, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Dhaka, P. 11

৩. *গ্রাফোসম্যানের নতুন ভূচিত্রাবলী*, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-III.

৪. আবুল কালাম শেখ নূর মোহাম্মদ, *নবাবগঞ্জ পরিচিতি*, প্রকাশনায় : রাজশাহী জেলা কাউন্সিল, রাজশাহী, ১৩৭৩, পৃ. ২-৩

৫. কাজী রওশন আলী, *বিভাগ গাইড—রাজশাহী*, নিউ বিজনেস পোস্ট পাবলিকেশন, বলিরঘাট, নওগাঁ, ১৯৯৫, পৃ. ২১০

৬. A. E. Porter (Editor), *Sensus of India*, 1931, Bengali & Sikkim, Part-1, Volume-V, P. 374

৭. Dr. Asraf Siddique (Editor), *Bangladesh District Gazetteer, Rajshahi,* 1979, P. 231

৮. Ibid, P. 13

৯. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব,* নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৬

১০. *Bangladesh Bureau of Statistics, Rajshahi,* September 1987, Statistics divison, Ministry of Planning, Dhaka, P. 26

১১. একভাষী বলতে মূলত বাংলাভাষী বোঝান হয়েছে। যদিও পেশাগত ও ধর্মীয় রীতি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। আঞ্চলিক ছাঁদের ক্ষেত্রে আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে।

১২. শামসুল হক, 'উত্তরবঙ্গের জনজীবন', *মাহে-নও,* অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, পৃ. ১৩

১৩. মার্কস-এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো,* পিকিং, ১৯৬৩, পৃ. ৩৬

১৪. যদিও ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রকোপে সেই মূল্যবোধ ক্রমেই ক্ষয়িষ্ণু ও ভাঙনের মুখে নিপতিত।

১৫. আবদুর রহীম খোন্দকার, 'গৌড়ীয় উপভাষা', *সাহিত্যিকী,* বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক, মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, ১৮শ বর্ষ, শরৎ-বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ. ১৬৫

১৬. নির্মল দাশ, *উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ,* সাহিত্য বিহার, কলিকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১০

১৭. মনিরুজ্জামান, *উপভাষাচর্চার ভূমিকা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৪, পৃ. ১৮৪

১৮. মনসুর মুসা, 'ভাষা, সমাজ ও শ্রেণী : ধারণার পুনর্বিচার', *ভাষা শ্রেণী ও সমাজ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১০

১৯. দ্রষ্টব্য: মৃণাল নাথ, *সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের রূপরেখা,* বাংলাদেশ ভাষা সমিতি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪২-৪৬

২০. নির্মল দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

২১. পবিত্র সরকার, 'বাংলা গালাগালের ভাষাতত্ত্ব', *লোকভাষা, লোকসংস্কৃতি,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৯৭, পৃ. ১০৮

২২. আবদুর রহীম খোন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

২৩. মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা' (প্রবন্ধ), *সাহিত্য পত্রিকা,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শীত ১৩৮৮, পৃ. ২৪৬

২৪. আবদুর রহীম খোন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

২৫. পি. এম. সফিকুল ইসলাম, *রাজশাহীর উপভাষা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯২, পৃ. ৬৭

২৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত,* রেনেসাঁস প্রিন্টার্স , ঢাকা, ১৯৮১,পৃ. ৬৯

২৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

২৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ. ৫১